হয়েছে।

শকুন্তলা : 'বীরাঙ্গনা'র এই নায়িকা অন্য চরিত্রগুলির ব্যতিক্রম নন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আধুনিকতা ফুটে উঠেছে কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। এগুলি হল : স্বগতোক্তি ও নিজেকে নিজে সম্বোধন করা। পরোক্ষভাবে নিজেকে উল্লেখ করবার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায়; শকুন্তলা তাঁর চিঠির সূচনাতেই বলেন, 'বন নির্বাসিনী দাসী নামে রাজপদে,/রাজেন্দ্র।' প্রথম পুরুষে নিজেকে এই ভাবে পরোক্ষ উল্লেখে নম্রতার দিক ফুটে উঠলেও এর প্রধান দিকটি হল, নিজের বিশিষ্টতাটুকু ফুটিয়ে তোলা। এই পদ্ধতি মাইকেলের একটি কাব্যকৌশলেরও অন্তর্গত।

শকুন্তলা বলেছেন : 'হায় আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!' এই "পাগলিনী" আখ্যা আসলে বিপরীত ও বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত : তা শকুন্তলারই আত্মচেতনাকে ব্যক্ত করেছে। তিনি যখন বলেন : 'মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে', তখন নিন্দাত্মক 'পোড়া' বিশেষণ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হয়ে ওঠে; 'পোড়াঅধর', 'পোড়াপ্রাণ', 'পোড়াহৃদয়' এই সূত্রকেই সমর্থন করে; এরা যে বিরুদ্ধ অর্থেই প্রযুক্ত তার প্রমাণ দু'টি : **প্রথমত**, প্রায় সব পত্রিকাতেই তা গৃহীত; **দ্বিতীয়ত**, যেমন আছে আত্মগঞ্জনা ও আত্মধিক্কার, তেমনি আছে নায়কদের তিরস্কার। যেমন, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করেছেন : 'শুখাইলে ফল, কবে কে আদরে তারে?' কিংবা 'যে তরুর মূলে / গন্ধর্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে...' ইত্যাদি উক্তিতে দুষ্মন্তকে স্পষ্ট ছলনাকারী বলা হয়েছে। শেষে দুষ্মন্তকে রীতিমতো কারণ দর্শাতেও বলেছেন শকুন্তলা : 'কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, / দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণযুগে?' এবং তারপর,—'এ মনে সুখপাখি ছিল বাসা বাঁধি, / কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে / নরাধিপ?' দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত নম্রতা ও পরোক্ষ উল্লেখের মধ্য দিয়ে পত্রিকা শুরু করে ক্রমই বিকাশমান শতদলের মতোই শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে। শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের আর এক দিক হল—ধর্ম, নিয়তি, অদৃষ্ট প্রভৃতির পটভূমিকা গ্রহণ। 'বীরাঙ্গনা'র প্রায় সব নায়িকাই এইগুলি ব্যবহার করেছেন। অদৃষ্ট ও নিয়তির অভিভব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত করে। হীনমন্যতায় ডুবিয়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ডটিকে ভেঙে দেয়। শকুন্তলার ক্ষেত্রে দুটি কারণে তা ঘটে নি, যদিও শকুন্তলা নিজেকে নিয়তি-নিপীড়িতা বলে মনে করেছেন। এই না ঘটার দুটি কারণ আছে। **প্রথমত**, বিধাতার কাছে তাঁর বলিষ্ঠ প্রশ্ন : 'হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে? / এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু শাখে?' নিয়তিকে মানুষ কোনোদিন খণ্ডাতে পারে না, কিন্তু অসহায় ক্রীড়নক না হয়ে সহজ কথাভঙ্গিতে, তুচ্ছার্থক 'তুই' সম্বোধন করে এই যে জিজ্ঞাসাটুকু, তাতেই শকুন্তলার ব্যক্তিত্বটুকু ধরা পড়েছে। **দ্বিতীয়ত**, তাঁর আশাবাদ। পত্রের প্রথমেই পাই, তিনি 'আশামদে মত্ত'; পত্রের অন্তিম পংক্তি : 'জীবনের আশা, হায় কে ত্যাজে সহজে।' দুষ্মন্তকে দাসী

ভাবে সেবা করাই তাঁর 'চির-আশা।' এই আশাবাদ নিয়তির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছে—তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সূচক।

ভাগ্য ও নিয়তির কাছে শকুন্তলা যখন সরাসরি প্রশ্ন করেন (যেমন, ওপরের উদাহরণে কিংবা, তারপর : 'কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়াম্বনা'।) তখন তা স্বগতোক্তিমূলক বলেই আত্মচেতনা বেশি করে ধরা পড়ে। স্বগতোক্তিগুলি নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এসে পড়ে। দুষ্মন্তের উদ্দেশে কথাগুলি বলতে বলতে, অকস্মাৎ নিজের উদ্দেশে, নিজের মনের অতল তল থেকে, জীবনের বিরাট এক অভিজ্ঞতার সারাৎসার তত্ত্বরূপে, মন্তব্য ও জিজ্ঞাসার যুগলমূর্তিতে এই আত্মোক্তি আত্মসচেতনতার নামান্তর হয়ে উঠেছে।

শকুন্তলা দুষ্মন্তের উদ্দেশে যে সব আখ্যা-অভিধা-বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, (যেমন, রাজেন্দ্র, মহীনাথ, নৃমণি, নৃপিত, নরেশ্বর, নরাধিপ, ধীমান্) একজন আশ্রমিকা তরুণী রূপে তাতে দুজনের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এর ফলে মনে হতে পারে, দুষ্মন্তের ব্যক্তিত্বের আলোকে শকুন্তলা ম্লান হয়ে গেছেন। এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর বিখ্যাত 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে। অবশ্য কালিদাসের শকুন্তলার প্রসঙ্গে। আমরা মাইকেলের শকুন্তলাকেই আলোচনায় গ্রহণ করছি। মাইকেলের শকুন্তলা যে এই সব ঐশ্বর্যদ্যোতক বিশেষণ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছেন, তার কারণ : **প্রথমত**, এই ধরনের বিশেষণ 'বীরাঙ্গনা'র সব নায়িকাই নায়কদের উদ্দেশে প্রয়োগ করেছেন; কাজেই এটি যে কেবলমাত্র সরলা আশ্রমিকার হীনমন্যতাদ্যোতক—তা নয়; **দ্বিতীয়ত**, আমরা দেখিয়েছি, দুষ্মন্তের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া, তাঁকে প্রশ্ন করা, নিয়তির কাছে প্রশ্ন করতে শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে। একদিকে নিজেকে এক অতি দীন নারীরূপে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থাপনা করা, পরোক্ষে উল্লেখ করা; অপরদিকে সেই সব দীনতাবাচক শব্দকে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থে ব্যবহার করা,—এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট প্রতিফলন আমাদের মানসে ধরা পড়ে। নিরাসক্তি ও ত্যাগের আদর্শও শকুন্তলার ব্যক্তিত্বকে আরও সংবদ্ধ মূর্তি দান করেছে। এ কারণেই মাইকেল দুষ্মন্তের প্রাসাদ ও ঐশ্বর্যের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, এই বর্ণনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি, শকুন্তলা যেমন রাজৈশ্বর্যের প্রতি আসক্ত নন, তেমনি রাজার প্রতি আরোপিত বিশেষণগুলিও তাঁর ঐশ্বর্যমুগ্ধতা থেকে উৎসারিত হয়ে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিবন্ধকতা করেনি।

তারা : তারাই 'বীরাঙ্গনা'র সব নায়িকাদের মধ্যে সর্বাধিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষত। এমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন আর কেউই হন নি। তারা জানতেন, তাঁর প্রেম শুধু অশোভন ও অসমাজিকই নয়, অন্যায় এবং অবৈধও। তা জেনেও তিনি এই প্রেমের গতি রোধ করতে পারেন নি। এখানেই তাঁর দ্বন্দ্ব। তাঁর বিচারবোধ ও বিবেক-দংশন ছিল বলেই যুক্তিবোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল,—এবং সেই অসহায় দ্বন্দ্বজর্জর জীবনের ট্র্যাজেডিই তাঁকে আধুনিক নারী করে তুলেছে। তিনি যে লিখেছেন, চোখের কাজল দিয়ে চিঠি লেখার কথা—এর এক গভীর অর্থ আছে। এই কাজলের কালিমা আসলে তাঁর সচেতন অন্তরের গ্লানি, যা কুল-কলঙ্কের কালি। যুক্তিবোধ, নিজের সঙ্গে নিজের তর্ক, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য রচনা—এসবই আধুনিক মানসের লক্ষণ, এবং এখানেই তারার ব্যক্তিত্ব ও আধুনিকতা। রক্ষণশীল সমালোচক মহলে তারার পত্রিকাটি নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়েছে। দীননাথ সান্যাল মশাই তো অবৈধ প্রণয়ের প্রকাশের জন্যে পত্রিকাটিকে বর্জনই করেছেন। কিন্তু একটা দিক একটু তলিয়ে দেখলে সান্যাল মশাই হয়তো তারার মধ্যে একটি মানবিক দিক